গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ৯ সংখ্যা | ৬ - ১২ অক্টোবর ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

ডেঙ্গু ঃ দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি
কলকাতা পুরসভার বরোগুলিতে ডেপুটেশন

৩ অক্টোবর পুরসভা অভিযান

রাজ্যে প্রতিদিনই লাফিয়ে বাড়ছে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা। অথচ সরকারের পক্ষ থেকে আক্রান্ত এবং মৃত উভয় সংখ্যাই ক্রমাগত গোপন করে চলা হচ্ছে। মৃতের সংখ্যা ৫০ অতিক্রম করে গেছে। আক্রান্তের সংখ্যাও ৫০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। অথচ পুরসভার মনোভাব— সব ঠিক আছে। অন্য রাজ্যের থেকে এ রাজ্য ভাল আছে বলে স্তোক দিচ্ছেন পুরমন্ত্রী। অভিযোগ উঠছে, রক্তপরীক্ষার রেজাল্টেও ভাইরাল জ্বর হিসাবে দেখিয়ে ডেঙ্গুকে আড়াল করা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, হাসপাতালগুলিতে ডেঙ্গু রোগীদের জন্য যথেষ্ট সংখ্যায় বেড, ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে যথেষ্ট সংখ্যায় প্লেটলেটের সরবরাহেরও অভাব রয়েছে। পাড়ায়, বাজারগুলিতে যে পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন ছিল সে ক্ষেত্রেও ব্যাপক গাফিলতি লক্ষ করা যাচ্ছে।

এই অবস্থায় এলাকায় এলাকায় পরিচ্ছন্নতা, ব্লিচিং ছড়ানো, মশা মারা তেল স্প্রে করা, হাসপাতালগুলিতে ডেঙ্গু রোগীদের জন্য বেডের সংখ্যা বাড়ানো ও ওষুধ সরবরাহ এবং আরও বেশি হারে রক্ত পরীক্ষার দাবি নিয়ে এস ইউ

দুয়ের পাতায় দেখুন

৩ নম্বর বরোতে ডেপুটেশন। ৩০ সেপ্টেম্বর

বিদ্যুতের চার্জবৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ অ্যাবেকার
স্মার্ট মিটার প্রতিরোধের ডাক

সল্টলেকে বিদ্যুৎ ভবনে গ্রাহক বিক্ষোভ। ২৭ সেপ্টেম্বর

বিদ্যুতের চার্জ বৃদ্ধি ও স্মার্ট মিটারের নামে গ্রাহকদের যথেচ্ছ লুঠ করার প্রতিবাদে সল্টলেকের বিদ্যুৎ ভবনের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন হাজার হাজার গ্রাহক, ২৭ সেপ্টেম্বর।

বিক্ষোভ সভা থেকে গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার নেতৃবৃন্দ বলেন, রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির ২০২৩-২৪ বর্ষের ট্যারিফ অর্ডার কার্যকর করা শুরু হয়েছে। এই ট্যারিফ অর্ডারে ডিসকানেকশন ও রিকানেকশন চার্জ (৫০ কেভিএ লোড পর্যন্ত) ১০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করা হয়েছে। ফিক্সড চার্জ দ্বিগুণ, মিনিমাম চার্জ তিনগুণ, প্রতি কেভিএ-তে মিনিমাম চার্জ ক্ষুদ্রশিল্পে ২০০ টাকা, কৃষিতে ৭৫ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের ধুঁকতে থাকা শত শত ক্ষুদ্রশিল্পের মালিক বিদ্যুৎ বিলের চাপে লাইন সারেন্ডার করার আবেদন জমা দিয়েছেন। গত বছর বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ও এলপিএসসি-র চাপে চাষযোগ্য এলাকার প্রায় ৩০ শতাংশ জমিতে বোরো চাষ করতে পারেননি চাষিরা। প্রয়োজন ছিল শিল্পের স্বার্থে, কৃষির স্বার্থে বিদ্যুৎ বিল না বাড়ানো। সরকার তাঁর উল্টোটা করছে। এই ফিক্সড ও মিনিমাম চার্জের আক্রমণে বহু সাব-মার্সিবল বিদ্যুৎগ্রাহক লাইন কাটার আবেদন করেছেন।

রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন কোম্পানি (ডব্লুবিপিডিসিএল)-র চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে চারজন ডিরেক্টর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেন। অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস যে প্রশ্নগুলি তোলেন, তার কোনওটিরই উত্তর দিতে পারেননি তাঁরা। সুব্রত বিশ্বাস তাঁদের বলেন, ফিক্সড চার্জ আলাদা করে ধার্য করাটাই অযৌক্তিক। কারণ কোম্পানির মোট প্রয়োজনীয় রাজস্ব বা এআরআর-এর মধ্যেই ১৯টি আইটেম কোম্পানির মোট খরচ হিসাবে দেখানো হয়েছে। তার মধ্যে বিদ্যুৎ কেনা এবং ফুয়েল চার্জ ছাড়া ১৭টি আইটেম কোম্পানির হয় ফিক্সড বা ভেরিয়েবল কস্ট-এর মধ্যেই পড়ে। এই মোট ১৯ আইটেম ধরেই গ্রাহকের বিলে এনার্জি চার্জ হিসাব করা হয়। তা হলে

দুয়ের পাতায় দেখুন

সংরক্ষণ কি মহিলাদের ক্ষমতায়ন ঘটাবে?

সংসদে ১৯ সেপ্টেম্বর পাশ হয়ে গেল মহিলা সংরক্ষণ বিল— 'হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান'-এর প্রবক্তাদের নামাঙ্কিত 'নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম ২০২৩'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানিয়েছেন, স্বয়ং ঈশ্বর নাকি তাঁকে বেছে নিয়েছেন এই মহান কাজের জন্য। যদিও ঈশ্বরের সেই বার্তা তাঁর কাছে কে বা কারা পৌঁছে দিয়েছিল, সে কথা জানাননি তিনি। সংসদ জুড়ে সেদিন বিজেপি সাংসদদের তুমুল উচ্ছাস-উৎসাহ, দলের মহিলা সাংসদদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের বন্যায় প্রধানমন্ত্রীর ভেসে যাওয়া দেখে মনে হচ্ছিল দেশের মহিলাদের যাবতীয় সমস্যা এবার বোধহয় দূর হতে চলেছে। পরে জানা গেল, সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হলেও এই আইন এখনই কার্যকর হবে না। প্রথমে জনগণনা হবে (কবে হবে এখনও জানা নেই), তার ভিত্তিতে হবে আসন পুনর্বিন্যাস। জটিল সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে কত সময় লাগবে কেউ জানে না। অর্থাৎ মহিলা সংরক্ষণ আইন পাশ হওয়া মানেই তা কার্যকরী হওয়া নয়।

লোকসভা বা বিধানসভার কোন কোন কেন্দ্র মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হবে তা ঠিক করার ক্ষেত্রে জনগণনার কিন্তু এমনিতে কোনও ভূমিকা নেই। এটি লটারির মাধ্যমেই করতে হয়। অর্থাৎ, চাইলে প্রধানমন্ত্রী আসন্ন লোকসভা নির্বাচনেই মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ শুরু করতে পারতেন, কোনও বাধা ছিল না। কিন্তু তা না করে বিষয়টিকে বেশ কয়েক বছর পিছিয়ে দিল বিজেপি সরকার।

তা হলে এই বিল পাশ করানো নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দল যে উদগ্র ব্যস্ততা দেখালেন, তার উদ্দেশ্য কী? কেন এর জন্য সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকতে হল বিজেপি সরকারকে? সেই অধিবেশনে কোন কোন বিল আসতে চলেছে, তা নিয়ে এত গোপনীয়তা ও রহস্যই বা তৈরি করা হল কেন? অনেকে বলছেন, আসলে আগামী লোকসভা ভোটে দেশের মহিলাদের সমর্থন পেতেই নরেন্দ্র মোদি এই বিল পাশ করাতে এমন উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তো ভোটের আরও কাছাকাছি গিয়ে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনেও এই বিল নিয়ে আসা যেত! তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এই দ্রুততার প্রয়োজন ছিল অন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে। আসলে সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে আদানি গোষ্ঠীর শেয়ার সংক্রান্ত দুর্নীতির পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে

সাতের পাতায় দেখুন

বিজেপি সরকারের বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদ ত্রিপুরায়

বিজেপি শাসিত ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ রেগুলেটরি কমিশন বিদ্যুৎ মাশুল ৭ শতাংশ বাড়িয়ে দিল। ১ অক্টোবর থেকে তা কার্যকর করার কথা ঘোষণা হয়েছে। এই জনবিরোধী সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক।

তিনি বলেন, রাজ্যের জনসাধারণ যখন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি, রোজগারহীনতা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন সমস্যায় দিশেহারা, তখন ত্রিপুরা বিদ্যুৎ রেগুলেটরি কমিশন শারদোৎসবের সামনে ৭ শতাংশ বর্ধিত মাশুল জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিল। রাজ্যের আরক্ষা দপ্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর থেকে কোটি কোটি টাকার বকেয়া বিল আদায় না করে, পরিবহণজনিত ক্ষতি ও বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ না করে ক্ষতির সমস্ত দায়ভার গ্রাহকদের উপর চাপিয়ে দিতে কমিশন এই মাশুল বৃদ্ধি ঘটাল। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে তিনি রাজ্যের জনগণকে আহ্বান জানিয়েছেন।

স্মার্ট মিটার প্রতিরোধের ডাক

একের পাতার পর

এর বাইরে কোনও বিষয়ের জন্য আলাদা করে ফিক্সড বা ডিমান্ড চার্জ নেওয়া যায় না।

২০১৬ সালে রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের মাশুল অর্ডারে ইউনিট প্রতি ১ টাকা মাশুল কমাতে বলা হয়েছিল। এই বছরের ট্যারিফ অর্ডারে ২০১৬-১৭ বর্ষে যা ছিল ২০২৩-২৪ বর্ষেও গড় বিদ্যুতের মাশুল ৭ টাকা ১২ পয়সা, একই রাখা হয়েছে। গত ১ জানুয়ারি ২০২২, ডব্লুবিপিডিসিএল-এর চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ কমিয়ে এবং নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে তাঁরা প্রতি ইউনিটে ৭০ পয়সা খরচ কমাতে সক্ষম হয়েছেন। তা হলে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের দীর্ঘদিনের দাবি মতো বিদ্যুতের মাশুল কমানোর বাস্তব অবস্থাকে মান্যতা দিয়ে বিদ্যুতের দাম কমানো হবে না কেন? প্রশ্ন তোলেন অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস।

তিনি বলেন, ২০১৬-১৭ বর্ষেই অস্বাভাবিক হারে মাশুল বাড়ানো হয়েছিল, যা তখনকার সময়ে কোম্পানির প্রয়োজনেরও বেশি। আবার এই বাড়তি টাকা নেওয়া যাবে না বলা হলেও এমভিসিএ খাতে এপ্রিল ২০১৯ থেকে আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত কোটি কোটি টাকা গ্রাহকদের থেকে কোম্পানি তুলে নিয়েছে। সুতরাং মাশুলের বাড়তি টাকা এবং এমভিসিএ খাতের অন্যায়ভাবে কেটে নেওয়া টাকা গ্রাহকদের ফেরত দেওয়া উচিত।

পশ্চিমবঙ্গ একটি কৃষিপ্রধান রাজ্য এবং প্রান্তিক চাষির সংখ্যাই এখানে বেশি। দেশের মধ্যে পাঁচটি রাজ্যে কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়া হলেও পশ্চিমবঙ্গে কৃষিতে বিদ্যুতের মাশুল অন্যান্য রাজ্য থেকে বেশি। তিনি কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ারও দাবি জানান।

স্মার্ট প্রিপেড মিটার লাগানোর তীব্র বিরোধিতা করেন তিনি। গ্রাহকদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে সেই টাকাতেই বন্টন কোম্পানি ব্যবসা করবে, এটা অন্যায় ও অনৈতিক। স্মার্ট মিটার খারাপ হলে তা পরিবর্তন করা ও খারাপ মিটারের ভুতুড়ে বিল সংশোধন করা অসম্ভব। তা ছাড়া স্মার্ট মিটার চালু হলে মিটার রিডার সহ শত শত কর্মচারী কাজ হারাবে। এই স্মার্ট প্রিপেড মিটার ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের অধীনস্থ বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানিগুলিকে ব্যক্তি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার দিকেই ঠেলে দেবে। এর মাধ্যমে সহজেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুৎ শিল্পকে বেসরকারিকরণের উদ্দেশে তৈরি জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল ২০২২ কে বাস্তবায়িত করার পথে বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থাকে বেসরকারিকরণ করা যাবে। এই ভাবে সরকার জনগণকে বিদ্যুতের মতো পরিষেবা দেওয়ার দায়িত্ব অস্বীকার করবে। এই মারাত্মক আক্রমণ প্রতিরোধে দলমত নির্বিশেষে গ্রাহকদের প্রতিরোধ আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ।

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যশিবির

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে বউবাজার মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে 'স্যার নীলরতন সরকার পিপলস ক্লিনিক'-এর পরিচালনায় ২৬ সেপ্টেম্বর এক ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতেস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদান করেন এমএসসি-র সর্বভারতীয় সভাপতি ও প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন অন্য চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী ও স্থানীয় অধিবাসীরা। ডাঃ মণ্ডল বিদ্যাসাগরের জীবন ও তাঁর সেকুলার চিন্তা নিয়ে আলোচনা করেন। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রোগীদের পরীক্ষা করেন ও তাঁদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। এ ছাড়াও অনেকের ইসিজি এবং ব্লাড সুগার টেস্ট করা হয়। ক্যাম্পে দুই শতাধিক রোগী, ১৮ জন চিকিৎসক, ৯ জন নার্সিং স্টাফ উপস্থিত ছিলেন।

এই ক্যাম্প মানুষের মধ্যে প্রভূত উৎসাহের সৃষ্টি করেছে।

ডেঙ্গু ঃ দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে পুরসভায় ডেপুটেশন

একের পাতার পর

সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে ২৭-৩০ সেপ্টেম্বর কলকাতা কর্পোরেশনের বরোগুলিতে ডেপুটেশনের কর্মসূচি নেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে ১,২,৩,৫,৭,৯,১০,১১,১৩,১৪,১৫,১৬ নম্বর বরোতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সোনারপুর আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে বিডিও-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ৩ অক্টোবর ডাক দেওয়া হয় কলকাতা পুরসভা

৮ নম্বর বরোয় বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

অভিযানের। সোনারপুর, গড়িয়া, হরিনাভি ইউনিটের পক্ষ থেকে এলাকায় জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি, ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ব্যবস্থা ও রোগীদের সুচিকিৎসার দাবিতে সোনারপুর বিডিওতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিডিও এবং জয়েন্ট বিডিও দাবিগুলির যৌক্তিকতা

১৬ নম্বর বরোয় বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

মেনে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

খড়্গপুরে পুরসভা ও মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন ঃ খড়্গপুর আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে ২৮ সেপ্টেম্বর খড়্গপুর মহকুমাশাসককে এবং পরদিন স্থানীয় পুরসভায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয়, সারা রাজ্যের সঙ্গে খড়্গপুর এলাকাতেও ডেঙ্গুর প্রকোপ বিপজ্জনক হারে বাড়ছে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রচার যতখানি হচ্ছে মশার আঁতুড়ঘর ধ্বংসের কাজ সেই গুরুত্ব পাচ্ছে না। অবিলম্বে সাফাইয়ের কাজে গুরুত্ব দেওয়া, ডেঙ্গু আক্রান্তদের জন্য বিনামূল্যে রক্তপরীক্ষার ব্যবস্থা এবং চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থার দাবি জানানো হয়।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ঘুটিয়ারি শরিফের পূর্বতন হাড়দা-বাঁশড়া-নারায়ণপুর আঞ্চলিক কমিটির বিশিষ্ট পার্টি সংগঠক এবং এআইডিএসও-র প্রাক্তন জেলা সভাপতি কমরেড নুর ইসলাম শেখ ২০ সেপ্টেম্বর সকালে ঘুটিয়ারি শরিফ হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। দীর্ঘদিন ধরে তিনি নার্ভের সমস্যায় ভুগছিলেন। হার্টের সমস্যাও গুরুতর হয়।

তাঁর বিপ্লবী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মরদেহে মাল্যদান করেন দলের ক্যানিং সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড বাদল সরদার ও ক্যানিং-ঘুটিয়ারি শরিফ-চম্পাহাটি লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রতাপ নস্কর সহ অন্য কমরেডরা। প্রগতি সংঘের পক্ষ থেকেও মাল্যদান করা হয়। দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু বাড়িতে গিয়ে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

অত্যন্ত গরিব পরিবারের সন্তান কমরেড নুর ইসলাম শেখ ছাত্রাবস্থায় সাতের দশকের প্রায় শুরুতে প্রয়াত কমরেড প্রবোধ নস্করের মাধ্যমে দলের সঙ্গে যুক্ত হন। শুরু থেকেই তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ফলে অচিরেই লোকালের গণ্ডি পার হয়ে তিনি জেলার বিশাল এলাকা জুড়ে সংগঠন বিস্তৃতির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সে ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা ও যোগ্যতা ছিল অসামান্য।

গৌরবময় ভাষা শিক্ষা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের স্কুল, কলেজ ও নানা প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে আন্দোলনের কমিটি গড়ে তোলেন। তিনি বহু ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সহ সাধারণ মানুষকে আন্দোলনের সাথে যুক্ত করেন, যাঁরা অনেকেই পরবর্তীকালে দলের সাথে যুক্ত হন।

আদর্শগত ও তত্ত্বগত বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানা ও তা আত্মস্থ করার ক্ষেত্রে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। সাহিত্য- সংস্কৃতি-মার্ক্সবাদী তত্ত্বের যে কোনও বিষয় সহজ সরল ভাবে উপস্থাপন করার এক বিশেষ গুণ ছিল তাঁর। সমস্ত স্তরের মানুষের সঙ্গে সাবলীল ভাবে মিশতে পারতেন এবং জয় করতে পারতেন। দলের কেন্দ্রিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্নে তিনি ছিলেন অনুকরণীয় চরিত্র।

তাঁর এই গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামী জীবন ও কর্মের ছন্দপতন ঘটে যায় মানসিক রোগের আক্রমণে। চিকিৎসায় সুস্থ হলেও পূর্বের অবস্থায় আর তিনি ফিরে যেতে পারেননি। চরম দারিদ্রের মধ্যে থেকেও পার্টি চিন্তায় তিনি আজীবন ছিলেন সজাগ ও সুদৃঢ়। সরকারি নানা প্রলোভনেও তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে টলানো যায়নি। পার্টির পত্রপত্রিকা ও গণদাবীর সাথে তাঁর নিয়মিত সম্পর্ক ছিল। চায়ের দোকান, বাজার যেখানেই তিনি যেতেন, মানুষের সঙ্গে মিশতেন ও দলের বক্তব্য নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। সবসময় তিনি দলের কর্মসূচির খোঁজ নিতেন, অসুস্থ শরীরেও সাধ্যমতো যোগ দিতেন। জুনিয়র ও নতুন কমরেডদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল ও দরদি।

কমরেড নুর ইসলাম শেখ লাল সেলাম

সর্বহারা একনায়কত্বের যুগের অর্থনীতি ও রাজনীতি

ভি আই লেনিন

এ বছরটি বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও রুশ বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ। এই উপলক্ষে দলের পক্ষ থেকে বর্ষব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে গণদাবীতে তাঁর বিভিন্ন রচনার অংশ আমরা প্রকাশ করছি। এবার ১৯১৯-এ প্রাভদায় প্রকাশিত তাঁর একটি রচনা।

সোভিয়েত সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শিরোনামে যে বিষয়টি আছে, তা নিয়ে আমার একটা ছোট পুস্তিকা লেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দৈনন্দিন কাজের চাপে এই পুস্তিকার কয়েকটি অধ্যায়ের প্রাথমিক প্রস্তুতির কাজ ছাড়া আমি কিছুই করতে পারিনি। তাই ঠিক করেছি, এই বিষয় সম্পর্কে আমার মূল ভাবনা-চিন্তার একটা সংক্ষিপ্ত সারাংশ লিখব। সন্দেহ নেই, সংক্ষিপ্ত সারাংশের অনেক অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতা আছে। অবশ্য একটা পত্রিকায় ছোট একটা প্রবন্ধ লেখা যেতেই পারে। এই প্রবন্ধ সমস্যা সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাত করতে পারবে এবং বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টরা যখন এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন তখন এই লেখা তাঁদের আলোচনার ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে।

তত্ত্বগতভাবে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না যে, পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যে একটা উত্তরণকালীন পর্যায় আছে। এই পর্যায় এই দুই ধরনের সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলিকে এক সূত্রে গ্রথিত না করে পারে না। এই উত্তরণকালীন পর্যায় হল, মুমূর্ষু পুঁজিবাদ ও সবে জন্ম নেওয়া সাম্যবাদের মধ্যে সংগ্রামের যুগ। অন্য কথায় বলতে গেলে, যে পুঁজিবাদ পরাজিত হয়েছে কিন্তু এখনও ধ্বংস হয়নি, তার সাথে যে সাম্যবাদ জন্ম নিয়েছে কিন্তু এখনও দুর্বল— এই দুইয়ের মধ্যে সংগ্রাম।

শুধু মার্ক্সবাদীরাই নন, বিকাশের তত্ত্ব সম্পর্কে কম-বেশি পরিচয় আছে, এমন সমস্ত শিক্ষিত মানুষই জানেন, এই জন্য উত্তরণকালীন পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একটা সমগ্র যুগের প্রয়োজন রয়েছে। তবুও সমাজতন্ত্রে উত্তরণ প্রসঙ্গে যে সমস্ত কথা আমরা বর্তমান দিনের পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিনিধিদের মুখে শুনতে পাই তা এই নিশ্চিত সত্যের একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত। আবছা আবছা সমাজতন্ত্রের ছাপ থাকলেও, এরা সবাই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিনিধি। এদের মধ্যে আরও আছেন ম্যাকডোনাল্ড, জাঁ লঙ্গউয়েট, কাউটস্কি এবং ফ্রেডরিক অ্যাডলার।

পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের বিশেষত্ব হল, তাঁরা শ্রেণি সংগ্রামকে একেবারে সহ্য করতে পারেন না। তাঁরা আশা করেন শ্রেণি সংগ্রাম ছাড়াই তাঁরা কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন। তাঁরা আপস মীমাংসার মসৃণ পথ ধরে হাঁটবেন এবং শ্রেণি সংগ্রামের কষ্টকঠিন পথ এড়িয়ে চলবেন। তাই এই ধরনের গণতন্ত্রের পূজারীরা পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের জন্য একটা সমগ্র ঐতিহাসিক যুগের প্রয়োজনীয়তার কথা হয় এড়িয়ে চলেন, আর না হয় এক শ্রেণির সাথে আর এক শ্রেণির সংগ্রামের পরিবর্তে এই দুই বিরোধী শ্রেণির মধ্যে আপস মীমাংসার পথ খোঁজার কাজকেই নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করেন।

আমাদের দেশ রাশিয়া একটা খুবই পশ্চাদপদ দেশ। এর চরিত্র হল পেটি বুর্জোয়া। এই কারণে, এই দেশের সর্বহারা একনায়কত্বের চরিত্র বৈশিষ্ট্য উন্নত দেশগুলোর তুলনায় খানিকটা আলাদা হবে। কিন্তু মূল শ্রেণিসমূহ ও মূল সামাজিক উৎপাদনের রূপ, অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশেও যা, রাশিয়াতেও তাই। এই কারণে, এই সব বিশেষ বৈশিষ্ট্য মূল বিষয়কে প্রভাবিত করতে পারবে না।

এই সব মূল সামাজিক উৎপাদনের রূপ হল পুঁজিবাদ, ক্ষুদ্রপণ্য উৎপাদন এবং সাম্যবাদ। মূল শ্রেণিগুলো হল বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া (বিশেষ করে কৃষক সম্প্রদায়) এবং সর্বহারা শ্রেণি।

সর্বহারা একনায়কত্বের যুগে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হল শ্রমের যৌথতার প্রাথমিক রূপের সাথে পুঁজিবাদ ও ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদনের মধ্যে সংগ্রাম। শ্রমের এই যৌথতা কাজ করছে বিশাল রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে। আর পুঁজিবাদ টিকে আছে এবং শক্তি সঞ্চয় করছে ক্ষুদ্রপণ্য উৎপাদনের মধ্য দিয়ে।

রাশিয়ায় শ্রম যৌথতার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ। কারণ, প্রথমত উৎপাদন উপকরণের উপর ব্যক্তি মালিকানা অবলুপ্ত। এবং দ্বিতীয়ত সর্বহারা রাষ্ট্র সারা দেশ জুড়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জমি ও কলকারখানায় বৃহদায়তন উৎপাদনকে সংগঠিত করছে, উৎপাদনের বিভিন্ন শাখায় শ্রমশক্তি বণ্টন করছে এবং বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ভোগ্যপণ্য শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বণ্টন করছে।

আমরা রাশিয়ায় 'প্রথম স্তরের সাম্যবাদের' কথা বলি (১৯১৯ সালের মার্চে গৃহীত পার্টি কর্মসূচিতেও আমরা এইভাবে বলেছি)। কারণ রাশিয়ায় আমরা এই সব বিষয় আংশিকভাবে অর্জন করতে পেরেছি বা অন্য ভাবে বলতে গেলে, এই সব বিষয়ে আমাদের সাফল্য প্রাথমিক স্তরের। বিপ্লবের একটা আঘাতে তৎক্ষণাৎ যা করা যায়, সাধারণভাবে আমরা তা করেছি। যেমন, সর্বহারা একনায়কত্বের প্রথম দিন, ৮ নভেম্বর, ১৯১৭ সালে, বৃহৎ ভূস্বামীদের জমি আমরা বিনা ক্ষতিপূরণে কেড়ে নিয়েছি। কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা সমস্ত বড় পুঁজিপতিদের কল-কারখানা, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, ব্যাঙ্ক, রেল এবং এই ধরনের নানা জিনিসের মালিকদের সম্পত্তি আমরা বিনা ক্ষতিপূরণে কেড়ে নিয়েছি। শিল্পে বৃহদায়তন উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সংগঠন এবং মিল, কলকারখানা, রেল পরিবহণে 'শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ' থেকে 'শ্রমিকের প্রশাসন'- এ উত্তরণ— এই কাজ মূলত আমরা সম্পাদন করেছি। কিন্তু কৃষির ক্ষেত্রে এই কাজ আমরা সবে শুরু করেছি (শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্রের মালিকানাধীন জমিতে বৃহদায়তন রাষ্ট্রীয় খামার)। একইভাবে, কৃষিতে ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদন থেকে যৌথ কৃষিতে উত্তরণের জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট সমবায় সংগঠন গড়ে তুলতে শুরু করেছি। একইভাবে বলা যায়, ব্যক্তি ব্যবসার জায়গায় আমরা দ্রব্য বণ্টনের রাষ্ট্রীয় সংগঠন গড়ে তুলছি। অর্থাৎ, শহরে শস্য এবং গ্রামাঞ্চলে শিল্পদ্রব্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা রাষ্ট্রীয় সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলছি।

কৃষি উৎপাদন এখনও ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদন। এখানেই পুঁজিবাদের বিস্তৃত, ব্যাপক ভিত্তি অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত। এই ভিত্তির উপর পুঁজিবাদ দাঁড়িয়ে আছে, শক্তি সঞ্চয় করছে, এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই পুঁজিবাদ সাম্যবাদের বিরুদ্ধে তিক্ত সংগ্রাম পরিচালনা করছে। এই সংগ্রামের রূপ হল রাষ্ট্রীয় সংগ্রহ ও সাধারণভাবে দ্রব্যের রাষ্ট্রীয় বণ্টন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যবসা-বাণিজ্য ও মুনাফা করা।

(এর পর লেনিন রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নেতৃত্বে রাষ্ট্রের ফসল সংগ্রহের পরিমাণ কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তার পরিসংখ্যান পেশ করেছেন।)

শ্রমজীবী মানুষ যুগ যুগ ধরে চলে আসা ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের শোষণ নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। স্বাধীনতা ও সাম্যের দিকে এ হল যথার্থ পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপ গুণের দিক থেকে, চরিত্রের দিক থেকে, বিস্তৃতি ও দ্রুততার দিক থেকে দুনিয়ায় অতুলনীয়। যারা স্বাধীনতা ও সাম্যের কথা বলে সেই বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়াদের অনুগামীরা একে এতদিন অবহেলা করে এসেছে। অবশ্য স্বাধীনতা ও সাম্য বলতে এরা বোঝে বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্র। এরা একে সাধারণভাবে বলে 'গণতন্ত্র' বা 'খাঁটি গণতন্ত্র'— যা মিথ্যা ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের দরকার যথার্থ সাম্য, যথার্থ স্বাধীনতা (ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের হাত থেকে মুক্তি)। এই কারণে তারা দৃঢ়চিত্তে সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে দাঁড়িয়ে আছে।

কৃষক প্রধান এই দেশে কৃষকরাই সর্বহারা একনায়কত্ব থেকে সবচেয়ে প্রথম, সবচেয়ে দ্রুত, সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে। ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের অধীনে কৃষকরা অনাহারে থাকত। আমাদের দেশে শত শত বছর ধরে কৃষকরা কখনও নিজেদের জন্য কাজ করেনি। তারা অনাহারে থেকেছে। আবার শত শত কোটি পুদ (ওজন পরিমাপের রুশ একক) শস্য পুঁজিপতিদের হাতে, শহরে এবং বিদেশে রপ্তানির জন্য দিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। সর্বহারা একনায়কত্বের অধীনে এই প্রথম কৃষকরা নিজেদের জন্য কাজ করছে এবং শহরবাসীর তুলনায় বেশি খাবার পাচ্ছে। এই প্রথম কৃষকরা যথার্থ স্বাধীনতা কী তা অনুভব করতে পারছে। এই প্রথম তারা নিজেদের রুটি খাওয়ার স্বাধীনতা পেয়েছে, অনাহার থেকে মুক্তি পেয়েছে।

আমরা জানি জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পরিমাণে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাওয়ার লোকের অনুপাতে কৃষকরা জমি ভাগ করে নিয়েছে।

সমাজতন্ত্রের অর্থ হল শ্রেণি অবলুপ্তি।

শ্রেণি অবলুপ্তির জন্য প্রথমেই দরকার ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ করা। করণীয় কর্তব্যের এই অংশটা আমরা করেছি। কিন্তু তা একটা অংশ মাত্র। এবং তা ছাড়াও এই কাজটা করা খুব কঠিন নয়। দ্বিতীয়ত, শ্রেণি অবলুপ্তির জন্য যা করা দরকার তা হল শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে পার্থক্য দুর করা, সবাইকে শ্রমিকে পরিণত করা। এই কাজ এক ধাক্কায় করা যায় না। তুলনামূলকভাবে এই কাজ আরও কঠিন এবং বাস্তবে এই কাজ করতে বহুদিন লেগে যাবে। একটা শ্রেণিকে উৎখাত করে এই কাজ করা যাবে না। সমগ্র সমাজের অর্থনীতির সাংগঠনিক পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। ব্যক্তিগত, অসংগঠিত ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থাকে বৃহৎ সামাজিক উৎপাদন দ্বারা প্রতিস্থাপিত করেই এই কাজ করা যেতে পারে। এই উত্তরণের জন্য অনেক দিন দরকার। তাড়াহুড়ো করে অসতর্ক প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিলে এই উত্তরণের কাজে দেরি হবে এবং তাতে জটিলতার সৃষ্টি হবে। কৃষকদের এমন ধরনের সাহায্য করা দরকার যাতে তারা কৃষির সমস্ত প্রযুক্তিকে প্রভূত উন্নত করতে পারে, মৌলিকভাবে তার সংস্কার সাধন করতে পারে। এই ভাবেই কেবলমাত্র উত্তরণকে দ্রুততর করা যায়।

সমস্যার এই দ্বিতীয় ও সবচেয়ে কঠিন অংশটি সমাধান করার জন্য, বুর্জোয়াদের পরাজিত করার পর, সর্বহারা শ্রেণিকে দ্বিধাহীন চিত্তে কৃষকদের প্রতি তার কর্মনীতি নিম্নোক্ত মৌলিক পথে পরিচালনা করতে হবে।

সর্বহারা শ্রেণির কাজ হবে মালিক কৃষক থেকে শ্রমজীবী কৃষকদের পৃথক করা, যে কৃষক শ্রম দেয় আর যে কৃষক মুনাফা লোটে, সেই শোষক কৃষক থেকে শ্রমজীবী কৃষকদের পৃথক করা।

এই পৃথকীকরণের মধ্যেই রয়েছে সমাজতন্ত্রের সমগ্র মর্মবস্তু।

যারা সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ায়, কিন্তু কাজে বুর্জোয়া গণতন্ত্রী (মার্তভপন্থী, চার্নভপন্থী, কাউটস্কিপন্থী ইত্যাদি) তারা সমাজতন্ত্রের এই মর্মবস্তু বোঝে না। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

যে পৃথকীকরণের কথা আমরা এখানে বললাম, তা করা খুব কঠিন। কারণ বাস্তব জীবনে, যতই পৃথক হোক, যতই বিরোধী হোক, কৃষকদের সমস্ত বৈশিষ্ট্য একে অপরের সাথে মিলে মিশে আছে। তা হলেও, পৃথকীকরণ সম্ভব। শুধু সম্ভব বললে চলবে না, কৃষি

ছয়ের পাতায় দেখুন

মধ্যপ্রদেশে ভগৎ সিং জন্মদিবস পালিত

'ভগৎ সিং ইয়াদগার মঞ্চ'-এর উদ্যোগে গুনায় শহিদ ভগৎ সিং জন্মদিবস উদযাপন। ২৮ সেপ্টেম্বর

বেহাল রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে অবরোধ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মথুরাপুর-১ ব্লকের কৌতলা অঞ্চলের বামুনেরচক গ্রাম থেকে ঢোলার মাদারপাড়া পোল বাসট্যান্ড পর্যন্ত ভায়া ঘোড়াদল বাজারের 'কোম্পানির রাস্তা' চলাচলের একেবারে অযোগ্য হয়ে পড়েছে। প্রায় ১৩ কিমি দীর্ঘ এই রাস্তা এক দশকেরও বেশি সময়ে কোনও মেরামত হয়নি। সড়ক প্রশাসন সম্পূর্ণ উদাসীন। সুন্দরবন উন্নয়ন বোর্ডেরও কোনও নজর নেই।

রাস্তা মেরামতের দাবিতে ২৩ সেপ্টেম্বর কয়েকশো এস ইউ সি আই (সি) কর্মী সমর্থক ও সাধারণ মানুষ ঘোড়াদল বাজারে এক ঘন্টা ধরে রাস্তা অবরোধ করেন। পুলিশ প্রশাসন উপস্থিত হয়ে দ্রুত সংস্কারের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। অবরোধে নেতৃত্ব দেন দক্ষিণ লক্ষ্মীনারায়ণপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক সুকেশ হালদার, ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য পশুপতি বৈদ্য, শিশির সরদার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। তাঁদের আরও দাবি— ঘোড়াদলের বাজারে জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করতে হবে।

বহরমপুরে শ্রমিক অবস্থান

২১ সেপ্টেম্বর বহরমপুর প্রধান পোস্ট অফিস মোড়ে এআইইউটিইউসি মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বিড়ি শ্রমিক, মোটর শ্রমিক, আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি এবং মিড ডে মিল কর্মী, পরিযায়ী শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ অবস্থান হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কলকাতা জেলা সম্পাদক অনিন্দ্য রায়চৌধুরী। মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক আনিসুল আম্বিয়া জানান, জেলাশাসক অফিসে দাবিপত্র দেওয়া হলে অফিস সেক্রেটারি দাবিগুলির ন্যায্যতা মেনে নিয়ে বলেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের রেজিস্ট্রার তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন।

বাস দুর্ঘটনায় কোনও যাত্রীর মৃত্যু হলে ড্রাইভারদের বিরুদ্ধে হত্যার মামলা দেওয়া হয় এবং তাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করা হয়, এর ফলে ড্রাইভাররা বেকার হয়ে যান। মামলা চলাকালীন ড্রাইভাররা যাতে কাজ করতে পারেন তা দেখার আশ্বাস দেয় প্রশাসন।

শিলিগুড়িতে আশাকর্মীদের বিক্ষোভ

ভাগে ভাগে নয়, আশাকর্মীদের ইনসেন্টিভ একসঙ্গে দেওয়া, ফিক্সড ভাতা বৃদ্ধি, স্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে স্বীকৃতি সহ বিভিন্ন দাবিতে ২৬ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী (কনট্রাকচুয়াল) ইউনিয়ন (আরবান আশা) যৌথভাবে দার্জিলিং জেলা সিএমওএইচ দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় ও ডেপুটেশন দেয়।

শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে সুসজ্জিত মিছিল মহকুমা পরিষদের সিএমওএইচ দপ্তরে পৌঁছায়। ভেনাস মোড়ে অবরোধ করা হয়। ইউনিয়নের দার্জিলিং জেলা ইনচার্জ নমিতা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল সিএমওএইচ-এর কাছে ডেপুটেশন দেয়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন বনানী সাহা, রিঙ্কু বিশ্বাস, সরস্বতী মুখার্জী, রত্না মিশ্র অধিকারী, নমিতা সূত্রধর, বিদ্যা ছেত্রী, এলি মহান্তি, পলি আচার্য, শান্তা গোস্বামী, শম্পা দাস, সীমা সরকার প্রমুখ। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি জেলা ইনচার্জ জয় লোধ।

পাটের ন্যায্য দামের দাবিতে রাজ্য কনভেনশন

পাটচাষি সংগ্রাম কমিটি গঠিত

পাট চাষিরা চরম দুর্ভোগে। নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে, কঠোর পরিশ্রম করে পাট তৈরি করেও চাষিরা পাটের দাম পাচ্ছেন না। সার-বীজ-বিদ্যুৎ সহ কৃষি উপকরণ অগ্নিমূল্যে কিনে পাটের উৎপাদন খরচ কমপক্ষে কুইন্টাল প্রতি ৯ হাজার টাকা। সেখানে সরকার সহায়ক মূল্য বেঁধে দিয়েছে মাত্র ৫০৫০ টাকা, যা উৎপাদন খরচের প্রায় অর্ধেক। আবার সরকার যতটুকু দাম ঘোষণা করেছে, সেই দামে জেসিআই চাষিদের কাছ থেকে পাট কিনতে না নামায় বাজারে ফড়েরা প্রতি কুইন্টাল ৪ হাজার টাকারও নিচে চাষিদের পাট বেচতে বাধ্য করছে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দুই সরকারের ভূমিকায় পাট চাষিরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। পাট উৎপাদক জেলার চাষিরা প্রশাসনের নানা স্তরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন এবং আন্দোলনকে রাজ্য জুড়ে তীব্রতর করতে নদিয়া জেলার দেবগ্রামে ২৮ সেপ্টেম্বর এক কনভেনশনের ডাক দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের চার শতাধিক পাট চাষি প্রতিনিধি।

কনভেনশনে প্রতিনিধিরা

কনভেনশনে এক প্রস্তাবে বলা হয়, সরকার সিন্থেটিক দ্রব্য উৎপাদনকারী পুঁজিপতিদের স্বার্থে পাট চাষ ও পাট শিল্পকে বিপন্নতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সিন্থেটিক দ্রব্য পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর। অন্য দিকে পাট পরিবেশ বান্ধব। পাটজাত দ্রব্য সহজেই মাটিতে মিশে যায়। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। পাট গাছ পরিবেশে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ায়। সরকার এই সিন্থেটিক লবির স্বার্থে প্যাকেজিংয়ে সিন্থেটিক বস্তার বেশি ব্যবহার করে চলেছে। মার খাচ্ছে পাট শিল্প। বর্তমান গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও পরিবেশ সংকটের যুগে এই বাজারকে সরকার উদ্যোগ নিয়ে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

পাট চাষ ও পাটশিল্প শ্রমনিবিড়। এখানে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হয়। এ রাজ্যে কৃষি শ্রমিক ও চাষি মিলে প্রায় ৪০ লক্ষ পরিবার পাট চাষের সাথে যুক্ত। সরকারের ন্যূনতম দরদ থাকলে ৪০ লক্ষ পরিবারের ২ কোটি মানুষের স্বার্থকে এভাবে উপেক্ষা করতে পারে না।

কনভেনশনে দাবি তোলা হয়, ফার্মার্স কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ স্বামীনাথনের সুপারিশ ছিল ফসলের এমএসপি হওয়া উচিত কমপক্ষে উৎপাদন খরচের দেড়গুণ। এই সুপারিশ মেনে পাটের সহায়কমূল্য কমপক্ষে ১৩ হাজার টাকা প্রতি কুইন্টাল, পাট চাষিদের ১০০ শতাংশ সার্টিফায়েড বীজ সরবরাহ করতে হবে ও স্বল্পসুদে ঋণ দিতে হবে, জেসিআই-এর অনুরূপ 'জুট কর্পোরেশন অব বেঙ্গল' গঠন করতে হবে। ফড়েদের দ্বারা কৃষকদের ঠকানো আটকাতে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত ক্রয়কেন্দ্র খুলে সরাসরি চাষিদের কাছ থেকে পাট কিনতে হবে, পাট পচানোর জন্য উপযুক্ত জলাধার নির্মাণ করতে হবে।

কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক গোপাল বিশ্বাস। কনভেনশন থেকে পাট চাষিদের ঐক্যবদ্ধ করে রাজ্য জুড়ে বৃহত্তর আন্দোলন পরিচালনার জন্য রুহুল আমিন ও দাউদ গাজিকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক এবং সেখ কামালউদ্দিন ও মনিরুল ইসলামকে সহ সভাপতি করে ৩২ জনের শক্তিশালী 'সারা বাংলা পাট চাষি সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়।

কমিটি আগামী ৯ অক্টোবর জেসিআই-এর রাজ্য দপ্তরে বিক্ষোভ এবং উত্তরবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া সহ বেশ কয়েকটি জেলায় জেলাশাসক দপ্তরে ডেপুটেশনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

মোটরভ্যান চালকদের বিক্ষোভ

মোটরভ্যান ও টোটো চলাচলে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে হুগলি জেলার পুলিশ কমিশনারেট দপ্তরে বিক্ষোভ ডেপুটেশনে সামিল হলেন কয়েক হাজার টোটো ও মোটরভ্যান চালক। ২৬ সেপ্টেম্বর এ আই ইউ টি ইউ সি-র হুগলি জেলা সম্পাদক কমরেড তপন দাসের নেতৃত্বে এক সুশৃঙ্খল মিছিল চুঁচুড়া স্টেশন থেকে পুলিশ কমিশনারেট দপ্তরে আসে।

সেখানে অবস্থান বিক্ষোভে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ও সারা বাংলা মোটর ভ্যান চালক ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড অশোক দাস এবং সারা বাংলা ই-রিক্সা (টোটো) চালক ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক কমরেড শ্যামল রাম। উভয়েই আগামী ১০ অক্টোবর কলকাতায় পরিবহণ দপ্তরে ডাকা বিক্ষোভ ডেপুটেশন কর্মসূচি সফল করা ও টোটো মোটরভ্যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানান। পরে প্রশাসনের সাথে আলোচনার সারাংশ মোটরভ্যান চালকদের সামনে তুলে ধরেন সংগঠনের জেলা সভাপতি কমরেড মিলন রক্ষিত।

নয়া স্কুলশিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে নেপালের শিক্ষকরা আন্দোলনে

নেপালে নতুন যে স্কুলশিক্ষা বিলটি এনেছে সরকার, তা সম্পূর্ণ শিক্ষাস্বার্থবিরোধী। এই বিলের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন হাজার হাজার শিক্ষক। নতুন বিলে গোটা শিক্ষাক্ষেত্রটিই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মনে করছেন শিক্ষকরা। এই বিল এমনকি শিক্ষকদের ইউনিয়ন করার অধিকার, চাকরির নিরাপত্তা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বশাসনের অধিকারও কেড়ে নেবে। ছাত্রদের স্বার্থও এই বিলে বিপন্ন হবে। প্রতিবাদে স্কুলে ধর্মঘট করে সরকারের এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন শিক্ষকরা।

পুলিশ ব্যারিকেডের মুখোমুখি আন্দোলনকারী শিক্ষকরা

১৩ সেপ্টেম্বর নেপাল সরকার পার্লামেন্টে এই বিল নিয়ে এলে শিক্ষকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। দেশের ৩৪ হাজার স্কুলের শিক্ষকরা কাজের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হন। অস্থায়ী শিক্ষকদের স্থায়ীকরণ, পদ বাড়ানো, পদোন্নতি, শিশুশিক্ষার স্তরে শিক্ষকসংখ্যা আরও বাড়ানো, অধ্যক্ষ নিয়োগ, পেনশন সমস্যার সমাধান, বদলি ও তাঁদের কাজের মূল্যায়ন নিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ২০ সেপ্টেম্বর রাজধানী কাঠমান্ডুতে পার্লামেন্টের সামনের রাস্তা অবরোধ করেন ১ লাখেরও বেশি শিক্ষক। বেগতিক বুঝে শয়ে শয়ে পুলিশ কাঁটাতার এবং লোহার ব্যারিকেড দিয়ে রাজপথে শিক্ষকদের আটকে দেন। সেখানে পুলিশের সাথে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের ধস্তাধস্তি হয়। শিক্ষকদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কিন্তু তাতেও আন্দোলনকারী শিক্ষকদের দমানো যায়নি। লাগাতার ৪ দিন স্কুল বন্ধ রেখে আন্দোলন চালিয়ে যান শিক্ষকরা। অবশেষে সরকার স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি, শিক্ষকদের ইউনিয়ন করার অধিকার সহ বিভিন্ন দাবি মেনে নেওয়ায় ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। যদিও বাকি দাবিগুলি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারী শিক্ষকরা।

এই বিলের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের হাতে অনেক ক্ষমতা তুলে দিতে চাইছে নেপাল সরকার। এর মাধ্যমে সরকার শিক্ষার দায়িত্ব কার্যত নিজ কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। স্কুলের মান নির্ধারণ, স্কুল স্থানান্তর এবং স্কুল বন্ধ করার ক্ষমতাও তুলে দেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েত-পুরসভার মতো স্থানীয় প্রশাসনের হাতে। শিক্ষকদের অনেকেই মনে করছেন, এতে শিক্ষার মানের চূড়ান্ত অবনমন ঘটবে। এ ছাড়াও এই বিল শিক্ষকদের কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে এবং আন্দোলনে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

ভারত সরকারও জাতীয় শিক্ষানীতিতে পঞ্চায়েত-পুরসভার হাতে শিক্ষার দায়িত্ব তুলে দেওয়ার সুপারিশ করেছে। এখানেও বিজেপি সরকার জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রের স্বাধিকার হরণ, শিক্ষকদের চাকরির নিরাপত্তা হরণ করছে। নেপালের পুঁজিবাদী সরকারও একই কাজ করছে। আসলে দুটি দেশই বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়মে শিক্ষাকে পণ্য হিসাবে দেখছে। শিক্ষা নিয়ে বেসরকারি ব্যবসার বিস্তার ঘটাতে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হচ্ছে পরিকল্পিত ভাবে। আশার কথা, নেপাল কিংবা ভারত দুটি পুঁজিবাদী দেশেই শাসকদের আক্রমণের প্রতিবাদে আন্দোলনের পথকেই বেছে নিয়েছেন শিক্ষকদের সাথে ছাত্র এবং অভিভাবকরাও।

হরিহরপাড়ায় পাট পুড়িয়ে চাষিদের বিক্ষোভ

এসইউসিআই(সি)-র উদ্যোগে ২৩ সেপ্টেম্বর পাট পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়ার চাষিরা। চাষিদের মিছিল হরিহরপাড়া বাজার পরিক্রমা করে। কুইন্টাল প্রতি পাটের দাম ১৩,০০০ টাকা করার দাবিতে বক্তব্য রাখেন হরিহরপাড়া পূর্ব লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড মহসিন আলি এবং পাটে অগ্নিসংযোগ করেন দক্ষিণ লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড মনোজ মণ্ডল। সমগ্র কর্মসুচি পরিচালনা করেন উত্তর লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড আলাউদ্দিন মণ্ডল।

এই কর্মসূচি নিয়ে এলাকায় প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে। এলাকার মানুষ বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে নিচ্ছেন।

জনজীবনের সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে

আগরতলায় বিক্ষোভ, মেয়রকে ডেপুটেশন

আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এলাকা সহ সারা রাজ্যে ডেঙ্গু জ্বর মহামারীর আকার নিয়েছে। দুই শতাধিক ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে রক্ত সংগ্রহ করে সরকারিভাবে জ্বর নির্ণয়ের কোনও ব্যবস্থা নেই। মশা নির্মূলীকরণের যেসব আধুনিক ব্যবস্থা আছে তা উপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। বর্ধিত এলাকা থেকে পৌরকর আদায় করা হলেও সেখানে স্ট্রিট লাইট, রাস্তা ও পাকা ড্রেন, ডাস্টবিনের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই।

পুরনো এলাকা সহ বর্ধিত এলাকায় পরিশোধিত ও পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে না। ভেঙে যাওয়া রাস্তা মেরামত করা হচ্ছে না। উপরন্তু পৌরকর্তৃপক্ষ রাস্তার পাশের দোকান ও অস্থায়ী দোকান সহ হকারদের জীবন-জীবিকা উপার্জনের বিকল্প ব্যবস্থা তথা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই উচ্ছেদ করে দিচ্ছে। তাতে হাজার হাজার গরিব মানুষ অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। ভুলে ভরা বার্থ সার্টিফিকেটের পরিণামে নাগরিকদের প্রশাসনিক হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

এমনিতেই আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, রোজগারহীনতা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যয়বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ দিশেহারা। সম্পদ কর পুনর্বিন্যাসের যে পরিকল্পনা চলছে তা জনগণের উপর বাড়তি কর চাপানোর উদ্যোগ বলে নাগরিকরা আশঙ্কা করছেন। এই পরিস্থিতিতে এস ইউ সি আই (সি) দলের পক্ষ থেকে নাগরিক জীবনে স্বস্তি দিতে উপরোক্ত সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে সিটি সেন্টারের সামনে বিক্ষোভ সভা সংগঠিত হয়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন দলের আগরতলা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত চক্রবর্তী। কর্পোরেশনের মেয়রের উদ্দেশে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

আগরতলায় সিটি সেন্টারের সামনে বিক্ষোভ

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রত্যাহারের দাবিতে

কেরালায় রাজভবন অভিযান

বিজেপি সরকারের আনা জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল করার দাবিতে ১৬ সেপ্টেম্বর কেরালার তিরুবনন্তপুরমে রাজভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিল অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির কেরালা শাখা। শুরুতে এক সভায় জেএনইউ-এর অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ সিনহা বলেন, এই শিক্ষানীতি মিষ্টি কথার আড়ালে প্রতারণায় ভরা এবং বিপজ্জনক। শিক্ষা ধ্বংসকারী এই নীতি অবিলম্বে বাতিল করার দাবি জানান তিনি।

বিশিষ্ট কবি কুরিপুঝা শ্রীকুমার বলেন, কেরালার মানুষ যে এই নীতি মেনে নেবেন না তা এখনই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানিয়ে দিক রাজ্য সরকার। তিনি 'শিক্ষার জন্য সংগ্রামে'র উপর রচিত কবিতা পাঠ করেন।

বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, চিকিৎসক, গণআন্দোলন ও মানবাধিকার আন্দোলনের নেতা প্রমুখ এই অভিযানে অংশ নেন। কমিটির রাজ্য সভাপতি জর্জ জোসেফ, সম্পাদক অ্যাডভোকেট এন শান্তিরাজ বক্তব্য রাখেন।

উত্তরপ্রদেশে শিশু-কিশোর শিবির

'সেভ চিলড্রেন সেভ নেশন'— আহ্বান নিয়ে উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড় জেলার পাট্টিতে দলের জেলা কমিটির উদ্যোগে ২৩-২৪ সেপ্টেম্বর শিশু-কিশোর শিবির অনুষ্ঠিত হয়। নবজাগরণের মনীষী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বিপ্লবী শহিদদের বিষয়ে চর্চা হয়। খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিজ্ঞান প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। ১৫০-র বেশি শিশু-কিশোরের অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত এই শিবিরে দলের ও গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ভাত দেওয়ার মুরোদ নেই কিল মারার গোঁসাই

দেশ জুড়ে প্রায় এক কোটি মানুষ জীবিকা নির্বাহ করেন রেলে হকারি করে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে রেল হকারের সংখ্যা প্রায় দশ লাখ। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ট্রেনের এক বগি থেকে অন্য বগিতে দৌড়ঝাঁপ করে বেঁচে থাকার লড়াইতে টিকে থাকতে হয় তাঁদের। করোনা অতিমারিতে ট্রেন বন্ধথাকায় ভয়ঙ্কর দারিদ্র্যের রেশ কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রেলের একটা ছোট্ট বিজ্ঞপ্তিতে এই হকারদের জীবনে নেমে এসেছে গভীর অন্ধকার। পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, এখন থেকে রেলে কাউকে হকারি করতে দেওয়া যাবে না।

কোনও পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই কি রেলের এই বিজ্ঞপ্তি? এটা কি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা? একেবারেই না। আসলে একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণ ও বেসরকারিকরণের জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যে ভাবে উঠে-পড়ে লেগেছে, তারই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে ভারতীয় রেল। ইতিমধ্যেই আধুনিকীকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দোহাই দিয়ে বেশ কিছু রেল স্টেশন ও প্ল্যাটফর্ম বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। রেলের অব্যবহৃত জমি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকে স্বল্পমূল্যে লিজে দেওয়া হচ্ছে দীর্ঘ বছরের জন্য। ১৫০টি ট্রেনকে বেসরকারি পর্যটন সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং সেই মতো গত বছরের জুন মাসে দেশের প্রথম বেসরকারি ট্রেন চালু হয়েছে কোয়েম্বাটুরে। এই বছরের আগস্ট মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘটা করে ঘোষণা করেছেন 'অমৃত ভারত স্টেশন' প্রকল্পের। এর অধীনে দেশজুড়ে ৫০৮টি স্টেশনের খোলনলচে বদলে ফেলা হবে, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ৩৭টি স্টেশনও আছে। এইসব স্টেশনে থাকবে এস্কালেটর, বাতানুকূল ওয়েটিং রুম, পার্কিংয়ের ব্যবস্থা এবং বিনামূল্যে ৫ জি ওয়াইফাই পরিষেবা। যাত্রী-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য থাকবে কফিশপ, রেস্তোরাঁ থেকে বিভিন্ন দামী ব্র্যান্ডের পোশাকের দোকান যার সাথে দেশের গরিব খেটে খাওয়া সাধারণ যাত্রীদের কোনও সম্পর্কই নেই। বোঝাই যায়, আগামী দিনে ধীরে ধীরে এই সব স্টেশন তুলে দেওয়া হবে বেসরকারি সংস্থার হাতে, মুনাফা লোটার জন্য। ফলে পাল্লা দিয়ে বাড়বে প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দাম, ওয়েটিং রুমের জন্যও দিতে হবে চড়া চার্জ, বাড়বে নিত্যযাত্রীদের রেল ভাড়া।

রেলে হকার উচ্ছেদ

কিন্তু এই সমস্ত কিছুর সঙ্গে দিন আনা-দিন খাওয়া রেল হকাররা যে বড়ই বেমানান! তাই কর্তৃপক্ষ অনেক আগে থেকেই বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিয়েছে রেলে আর হকারি করা যাবে না। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বদান্যতায় তাই অচিরেই একদিকে আলোয় আলোয় ঝলমল করবে স্টেশনগুলো, অন্যদিকে গাঢ় অন্ধকারে ডুবে যাবে গরিব হকারদের জীবন। অসুবিধায় পড়বেন সাধারণ নিত্যযাত্রীরাও।

বর্তমানে হকারদের উপর আরপিএফের অত্যাচার ক্রমে বেড়েই চলেছে। কেস দেওয়া, জরিমানা করা, ভয় দেখিয়ে তোলাবাজি এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। শুধু তাই নয়, হকারদের শারীরিক নিগ্রহ, মালপত্র ফেলে দেওয়া, দোকান ভেঙে দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ আছে আরপিএফের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে হকাররা বেশ কয়েক বার বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, রেল অবরোধ করেছেন। কিছুদিন আগে হুগলির কোন্নগর স্টেশনের দোকানদারদের বলা হয় জমি জরিপের জন্য দু'দিনের জন্য দোকান সরিয়ে নিতে। দু'দিন পর জমি জরিপের কাজ শেষ হলে দোকানদাররা যখন স্টেশনে আবার দোকান বসাতে যান, বাধা দেওয়া হয় রেলের তরফে। এই দোকানদারেরা ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে স্টেশনে ব্যবসা করছেন। জীবিকায় বাধা পেয়ে নিরুপায় হকাররা একরকম জোর করেই দোকান বসান ওই স্টেশনে। রাতের অন্ধকারে রেল ওই দোকানগুলো পুনরায় ফেলে দিলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন হকাররা। প্রতিবাদ জানালে স্টেশন কর্তৃপক্ষ বলে ডিআরএমের নির্দেশে এই কাজ করা হয়েছে। এরপর গত ১৬ সেপ্টেম্বর হকারেরা জোট বেঁধে হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএমের সাথে দেখা করতে রওনা হন। ট্রেন স্টেশনে পৌঁছালে কার্যত বিনা প্ররোচনায় শতাধিক সিআরপিএফ লাঠি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে হকারদের উপর। এই বর্বরোচিত আক্রমণে বেশ কয়েকজন হকারের মাথা ফাটে, অনেকেই গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। সাধারণ যাত্রী থেকে চিত্র সাংবাদিক কেউই সেদিন রক্ষা পাননি। দুই যাত্রী সমেত

সাতের পাতায় দেখুন

সর্বহারা একনায়কত্বের যুগের অর্থনীতি ও রাজনীতি

তিনের পাতার পর

অর্থনীতি ও কৃষক জীবন থেকে এটা অবশ্যম্ভাবী রূপে ঘটবে। শ্রমজীবী কৃষকরা যুগ যুগ ধরে ভূস্বামী, পুঁজিপতি, শোষক ও মুনাফাখোর এবং তাদের রাষ্ট্রের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে। এমনকি, সবচেয়ে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রেও এই নির্যাতন চলছে। যুগ যুগ ধরে এই শ্রমজীবী কৃষকরা শোষক নির্যাতকদের সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে, তাদের শত্রু মনে করে। তাদের জীবনের বাস্তব পরিস্থিতি থেকেই এই মনোভাবের জন্ম হয়েছে। এর ফলে তারা পুঁজিপতি, মুনাফাখোর ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধেশ্রমিক শ্রেণির সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য হচ্ছে। আবার সাথে সাথে, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য, পণ্য উৎপাদনের জন্য এই কৃষকরা শোষক ও মুনাফাখোরে পরিণত হচ্ছে। (সব ক্ষেত্রে হচ্ছে তা নয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হচ্ছে।) —

আমরা সংবিধান সভা ভেঙে দিয়েছি। আমরা উদ্বৃত্ত শস্য জোর করে কেড়ে নেওয়া সহ এই ধরনের নানা কাজ করেছি। আমাদের সংবিধানে শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে পার্থক্য আছে। এই সব দেখিয়ে ওরা তারস্বরে বলে, তোমরা গণতন্ত্র, সাম্য ও স্বাধীনতাকে ধ্বংস করেছ। জবাবে আমরা বলি, শত শত বছর ধরে শ্রমজীবী কৃষকরা যে প্রকৃত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সেই প্রকৃত অসাম্য দূর করার জন্য দুনিয়াতে কোনও দিন কোনও রাষ্ট্র এমন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। শোষক ও শোষিতের, অনাহারক্লিষ্ট ও ভরপেট খাওয়া মানুষের সাম্য আমরা কখনই স্বীকার করি না, স্বীকার করি না একের দ্বারা অপরের লুট করার স্বাধীনতা। যে সব শিক্ষিত মানুষ এই পার্থক্য স্বীকার করতে চায় না, তারা নিজেদের গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী, কাউটস্কিপন্থী, চার্নভ ও মার্তভপন্থী বললেও আমরা তাদের সাথে হোয়াইট গার্ডের মতো ব্যবহার করি।

সমাজতন্ত্রের অর্থ হল শ্রেণি অবলুপ্তি। শ্রেণি অবলুপ্তির জন্য সর্বহারা একনায়কত্ব যা করার তা করছে। কিন্তু এক ধাক্কায় শ্রেণি অবলুপ্তি ঘটানো যায় না। সর্বহারা একনায়কত্বের যুগে শ্রেণি বিভক্তি আছে এবং শ্রেণি বিভক্তি থাকবে। যখন শ্রেণি বিভক্তি থাকবে না, তখন সর্বহারা একনায়কত্বের প্রয়োজনও থাকবে না। সর্বহারা একনায়কত্ব ছাড়া শ্রেণি অবলুপ্তি ঘটবে না।

শ্রেণি থাকবে, কিন্তু সর্বহারা একনায়কত্বে সমস্ত শ্রেণির ও শ্রেণি সম্পর্কের পরিবর্তন হবে। সর্বহারা একনায়কত্বে শ্রেণি সংগ্রামের অবসান হবে না, তার রূপ হবে আলাদা।

পুঁজিবাদে সর্বহারা শ্রেণি, নিপীড়িত শ্রেণি, উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা থেকে বঞ্চিত। এই শ্রেণিই একমাত্র শ্রেণি যে পুঁজিবাদের সরাসরি ও সর্বাত্মক বিরোধিতা করে এবং এই কারণে তার পক্ষেই সম্ভব শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী হিসাবে ভূমিকা পালন করা। বুর্জোয়াদের উৎখাত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার পর, এই সর্বহারা শ্রেণি শাসক শ্রেণিতে পরিণত হয়, তার হাতেই চলে যায় রাষ্ট্রক্ষমতা, তার হাতেই চলে যায় উৎপাদন উপকরণ। এই উৎপাদন উপকরণের চরিত্র হয়ে যায় সামাজিক। মধ্যবর্তী দোদুল্যমান শ্রেণি ও লোকজনদের সে নেতৃত্ব দেয়। সে শোষকদের ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের শক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারে। শ্রেণি সংগ্রামের এই হল সুনির্দিষ্ট কর্তব্য। এ এমন কর্তব্য যা সর্বহারা শ্রেণি আগে করেনি বা করতেও পারত না।

সর্বহারা একনায়কত্বে শোষক শ্রেণি, ভূস্বামী ও পুঁজিপতি শ্রেণি অবলুপ্ত হয়নি, এক মুহূর্তে তা অবলুপ্ত হতেও পারে না। শোষকেরা ধ্বংস হয়েছে কিন্তু অবলুপ্ত হয়নি। আন্তর্জাতিক পুঁজি হিসাবে তার আন্তর্জাতিক ভিত্তি আছে। রাশিয়ার পুঁজি এই আন্তর্জাতিক পুঁজির শাখা। উৎপাদন উপকরণের একটা অংশ এখনও তাদের দখলে, তাদের এখনও অর্থবল আছে, আছে বিস্তৃত সামাজিক যোগাযোগ। যেহেতু তারা পরাজিত হয়েছে, তাই তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা শত গুণ, হাজার গুণ বেড়ে গিয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনা, সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা এগিয়ে, অনেক এগিয়ে। তাই তারা সংখ্যায় কম হলেও তাদের গুরুত্ব অনেক বেশি। উৎখাত হয়ে যাওয়া শোষকদের বিরুদ্ধে শোষিতদের বিজয়ী অগ্রগামী অংশ অর্থাৎ সর্বহারাদের শ্রেণি সংগ্রাম তাই অনেক বেশি তিক্ত। বিপ্লবের ক্ষেত্রে এ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। যদি এই ধারণাকে কেউ সংস্কারবাদী চিন্তার দ্বারা প্রতিস্থাপিত না করে (যেমনভাবে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বীরেরা করেছেন)।

সবশেষে, সাধারণভাবে পেটি বুর্জোয়াদের মতো কৃষকরাও সর্বহারা একনায়কত্বেও মাঝপথে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে, এরা সংখ্যায় অনেক (পশ্চাদপদ রাশিয়ায় এরা সংখ্যায় বিশাল)। শ্রমজীবী এই কৃষকরা ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অভিন্ন লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আছে। অপর দিকে এরা বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট সম্পত্তির মালিক ও ব্যবসায়ী। এই ধরনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বুর্জোয়া ও সর্বহারা শ্রেণির মধ্যে দোদুল্যমানতার জন্ম দেবেই। এই বুর্জোয়া ও সর্বহারা শ্রেণির মধ্যে সংগ্রাম তীক্ষ্ণ রূপ ধারণ করার ফলে, তাদের মধ্যে সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে, পুরনো অচলায়তনের সাথে কৃষক ও পেটি বুর্জোয়াদের দীর্ঘদিনের সংযোগের ফলে আমরা দেখতে পাব এরা একবার এ দিকে যাচ্ছে আর একবার ও দিকে যাচ্ছে, দেখতে পাবো ওরা দোদুল্যমান, অনিশ্চিত, অস্থায়ী।

এই শ্রেণি বা এই সমস্ত সামাজিক স্তর সম্পর্কে সর্বহারা শ্রেণির কর্তব্য হল এদের পরিচালনা করা, এদের উপর প্রভাব সৃষ্টি করা। যারা দোদুল্যমান, যারা অস্থিরমতি— সর্বহারা শ্রেণির কর্তব্য হল তাদের পরিচালনা করা।

সর্বহারা একনায়কত্ব যেভাবে বিভিন্ন শ্রেণি ও শক্তিগুলোকে এবং তাদের আন্তঃসম্পর্ককে খানিকটা পরিবর্তিত করে নিয়েছে তা যদি আমরা তুলনা করি, তা হলে আমরা বুঝতে পারব— সাধারণভাবে 'গণতন্ত্রের দ্বারাই' সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব, এই ধারণা কতটা অর্থহীন এবং তত্ত্বগতভাবে ভিত্তিহীন। বুর্জোয়াদের চূড়ান্ত শ্রেণিহীন গণতন্ত্রের কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তা থেকেই মূলগতভাবে এই ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি। বাস্তবে, সর্বহারা একনায়কত্বে গণতন্ত্র নিজেই একটা নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে, শ্রেণিসংগ্রাম উন্নত স্তরে পৌঁছেছে এবং সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

স্বাধীনতা, সাম্য ও গণতন্ত্র সম্পর্কে সাধারণভাবে কথা বলার অর্থ হল পণ্য উৎপাদন সম্পর্কের মধ্য থেকে উদ্ভূত ধারণার গতানুগতিক পুনরাবৃত্তি। এই ধরনের সাধারণ ধারণার দ্বারা সর্বহারা একনায়কত্বের সুনির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান করার চেষ্টার অর্থ হল বুর্জোয়াদের তত্ব ও নীতিকে গ্রহণ করা। সর্বহারার দৃষ্টিতে এই প্রশ্নকে এই ভাবে দেখা যেতে পারেঃ

কোন শ্রেণির নির্যাতন থেকে স্বাধীনতা? কোন শ্রেণিগুলোর মধ্যে সাম্য? ব্যক্তিসম্পত্তির ভিত্তিতে গণতন্ত্র, না ব্যক্তি সম্পত্তি অবলুপ্তির সংগ্রামের ভিত্তিতে গণতন্ত্র? ইত্যাদি, ইত্যাদি। অনেক দিন আগে এঙ্গেলস তাঁর 'অ্যান্টি ডুরিং' গ্রন্থে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছিলেন ঃ পণ্য উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যেই উদ্ভূত হয়েছে সাম্যের ধারণা। এ কুসংস্কারে পরিণত হবে যদি তা শ্রেণি অবলুপ্তির প্রেক্ষিতে না বোঝা হয়। সাম্য সম্পর্কে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ধারণার পার্থক্যের এই প্রাথমিক বিষয়টা নিয়তই ভুলে যাওয়া হয়। যদি এটা ভুলে যাওয়া না হয়, তা হলে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাব, বুর্জোয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করে সর্বহারা শ্রেণি, শ্রেণিঅবলুপ্তির পথে একটা সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এবং এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সর্বহারাকে শ্রেণি সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। চালিয়ে যেতে হবে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে, সংগ্রামের সমস্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে। এর দ্বারা উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া বুর্জোয়া ও দোদুল্যমান পেটি বুর্জোয়াদের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে যেতে হবে।

সংরক্ষণ কি মহিলাদের ক্ষমতায়ন ঘটাবে

একের পাতার পর

আদানি সাহেবের ঘনিষ্ঠতার বিষয়টি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে একেবারে সামনে চলে এসেছিল। দেশের মধ্যে জনগণও তা নিয়ে হাজারটা প্রশ্ন তুলছিল। তাই এ সমস্ত কিছু থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘোরাতেই কি এই মহিলা সংরক্ষণ বিল ও তা নিয়ে মোদিজি ও তাঁর দলবলের এ হেন ঢক্কানিনাদ? এতে ভোটেও সুবিধা হল, পাশাপাশি মহিলা-উন্নয়নে মোদিজি কতখানি উদগ্রীব, তারও একটা বিজ্ঞাপন তৈরি করা গেল!

আরও একটি বিষয় ভেবে দেখার মতো। এইসব গুরুতর প্রয়োজন না থাকলে বিজেপির মতো দলের তো নারী সংরক্ষণ নিয়ে এতটা উদ্যোগী হওয়ার কথাই নয়! কারণ, যে মনু নারীর কোনও অধিকারের কথাই স্বীকার করেনি, সেই মনুবাদী সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হিসাবে বিজেপি দলের মতে মহিলাদের স্থান ঘরের ভিতরে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাঁদের গুরু, আরএসএস-প্রধান মোহন ভাগবত স্বয়ং সেই ২০১৩ সালে মধ্যপ্রদেশে এক সভায় প্রকাশ্যেই বলেছিলেন, "স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে চুক্তির যে বন্ধন থাকে সেখানে স্বামী স্ত্রীকে বলেন, তুমি আমার ঘর-সংসারের যত্ন নাও, বিনিময়ে আমি তোমার সমস্ত প্রয়োজন মেটাব। তোমায় নিরাপদে রাখব। ... স্ত্রী যতদিন সেই চুক্তি মানে, স্বামী তার সঙ্গে থাকে। স্ত্রী চুক্তিভঙ্গ করলে স্বামী তাকে ত্যাগ করতে পারে" ইত্যাদি, ইত্যাদি। নিতান্ত দায়ে না পড়লে এ হেন বিজেপি যে মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে সরব হতে পারে না— এ কথা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

মহিলা সংরক্ষণ বিলের ইতিহাস বহু দিনের। ১৯৯৬ সালে কেন্দ্রে দেবেগৌড়ার প্রধানমন্ত্রীত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রথম সংসদে পেশ হয়েছিল এই বিল। সে বার বিলটি পাশ করানো যায়নি। পরে ২০১০ সালে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের আমলে বিলটি লোকসভা অবধি নিয়ে যাওয়ার পর সেটিকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। এবার আবার নরেন্দ্র মোদির বিজেপি সরকার বিলটিকে সংসদে আনল। এবারেও এই বিলে অধিকাংশ দলই অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে সমর্থন জানিয়েছে। বিরোধিতা যে সব দল করেছে, সংসদে মহিলাদের আসন সংরক্ষণে নয়, তাদের আপত্তির বিষয় ভিন্ন। অর্থাৎ সংসদে উপস্থিত সবক'টি দলই প্রমাণ করতে অতি মাত্রায় ব্যগ্র যে, নারী-কল্যাণে, দেশের মহিলাদের উন্নয়নে তারা অত্যন্ত আগ্রহী এবং মহিলা আসন সংরক্ষণকে সেই উন্নয়নের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বলেই তারা মনে করে।

কিন্তু লোকসভা ও বিধানসভাগুলিতে মোট আসনের ৩৩ শতাংশ মহিলাদের দখলে যাওয়ার সঙ্গে গোটা দেশের নারীসমাজের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের সম্পর্ক কী? এ দেশ তো বহু আগেই মহিলা প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি পেয়েছে। দেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতিও শুধু যে মহিলা তাই নয়, তিনি দেশের আদিবাসী সমাজের একজনও বটে। এতে দেশের আদিবাসী সমাজ ও সাধারণ মহিলাদের জীবনে সামান্যতম পরিবর্তন ঘটেছে কি? বরং আদিবাসী সমাজের সর্বনাশ হতে চলেছে যে নয়া বন সংরক্ষণ আইনে, তা তাঁর স্বাক্ষরেই আইনে পরিণত হয়েছে। অনেক রাজ্যেই মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন মহিলারা। সেখানে মহিলাদের বিশেষ কোনও উন্নয়ন হয়েছে নাকি? পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যে ধর্ষণ, পাচার, বধূ নির্যাতনের ঘটনা কি কোনও অংশে কমেছে? ইতিমধ্যেই দেশের পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলিতে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ চালু হয়েছে। কিন্তু তা দেশের পৌর ও গ্রামীণ এলাকাগুলির মহিলাদের জীবনে কতটুকু প্রভাব ফেলেছে?

কেমন আছে এ দেশের নারীসমাজ? নির্মম পুঁজিবাদী শোষণের কবলে পড়ে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও এমনিতেই আজ অসহনীয় দুর্দশায় জর্জরিত। এরই সঙ্গে পুরুষতন্ত্রের দাপটে বিরাট অংশের নারী নানা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ভয়ঙ্কর শিকার। তাদের অধিকাংশই ডুবে রয়েছে অশিক্ষা, অপুষ্টি, কুসংস্কারগ্রস্ত অন্ধ মানসিকতার অন্ধকারে। ঘরের বাইরে বেরিয়ে কাজে যুক্ত আছে মাত্র ২০.৬ শতাংশ নারী। শ্রমের বাজারে নারীদের অংশগ্রহণের এই হারও ক্রমাগত কমছে। সারা দেশে 'আশা', 'অঙ্গনওয়াড়ি' ইত্যাদি প্রকল্পে যে মহিলারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করছেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ন্যায্য বেতন দেওয়া দূরের কথা, তাঁদের শ্রমিকের স্বীকৃতিটুকু পর্যন্ত দিতে রাজি নয়। সরকারি হিসাবেই ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের প্রায় ৬০ শতাংশ রক্তাল্পতার শিকার। বাস্তবে এই হার যে আরও অনেক বেশি, চোখ মেলে তাকালেই সে সত্য ধরা পড়ে। দেশে নারী ধর্ষণ, নির্যাতন, ধর্ষণ করে খুন, পণ দিতে না পারায় বধূহত্যা, গার্হস্থ্য হিংসা, নারীপাচার, নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা ইত্যাদি অস্বাভাবিক দ্রুততায় বেড়ে চলেছে। জন্মের আগেই খুন হচ্ছে অসংখ্য কন্যাভ্রূণ।

সংসদ ও বিধানসভাগুলিতে মহিলা আসন সংরক্ষণের জন্য যারা আজ অতি সোচ্চার, সরকারি ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে পাক খাওয়া সেই সব বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলিই তো স্বাধীনতার পর গত ৭৫ বছরে কেন্দ্রে ও রাজ্যে রাজ্যে বহু বার সরকারি ক্ষমতায় আসীন হয়েছে! প্রশ্ন হল, সরকারি ক্ষমতায় বসে দেশের নারীসমাজের এই লজ্জাজনক দুরবস্থা দূর করতে এরা কী ভূমিকা পালন করেছে? বাস্তবে তারা কিছুই করেনি। আজ যারা মহিলা সংরক্ষণের স্লোগান দিয়ে নারী-উন্নয়নের চ্যাম্পিয়ন সাজতে চাইছে, তারাই ক্ষমতায় বসে নারীর পণ্যায়নে উৎসাহ দিয়ে চলে। ঢালাও মদের লাইসেন্স দিয়ে, মাদকের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে তারাই নারী নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার কাজে দুষ্কৃতীদের মদত দিয়ে চলে। যে নরেন্দ্র মোদি 'ঈশ্বরের নির্দেশে' নারী সংরক্ষণের 'ঐতিহাসিক ও মহান' কাজটি সারলেন, তাঁর দল বিজেপির প্রবল প্রভাবশালী সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে মাসের পর মাস অবস্থান আন্দোলন চালিয়েছেন মহিলা কুস্তিগিররা। অভিযুক্ত সাংসদকে গ্রেফতারের বদলে বিজেপি সরকারের পুলিশ আন্দোলনকারী মহিলাদেরই টেনে-হিঁচড়ে গ্রেফতার করেছিল। প্রধানমন্ত্রী নীরব ছিলেন। তাঁর সেই নীরবতা নির্যাতিতা মহিলাদের কোন সুরাহার উদ্দেশ্যে? মণিপুরে তরুণীকে বিবস্ত্র করে নির্যাতনের ঘটনায় দেশ জুড়ে আলোড়ন উঠলেও প্রধানমন্ত্রী রা কাড়েননি। সামান্য নিন্দাও করেননি এই অমানবিক বর্বরতার। বহুবারই বিজেপির প্রভাবশালী সাংসদ, বিধায়ক, নেতাদের বিরুদ্ধে মহিলাদের উপর পাশবিক নির্যাতন, হত্যা এমনকি নির্যাতিতার পরিজনদের খুন করার ঘটনায় গোটা দেশে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর অটল নীরবতা একবারের জন্যও ভঙ্গ হতে দেখা যায়নি। গুজরাটে বিজেপি সরকারের শাসনেই ধর্ষিত হয়েছিলেন বিলকিস বানো। চোখের সামনে উগ্র হিন্দুত্ববাদী দুষ্কৃতীদের হাতে আত্মীয়স্বজন সহ নিজের তিন বছরের শিশুকন্যার নির্মম হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী হতে হয়েছিল তাঁকে। প্রধানমন্ত্রীর দরদি মন কেঁদে উঠেছিল— না, অত্যাচারিতা, দুঃসহ যন্ত্রণা বুকের ভিতরে বয়ে বেড়ানো বিলকিসের জন্য নয়, তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন সাজাপ্রাপ্ত ধর্ষক, হত্যাকারীদের জেল-যন্ত্রণায়। তাই 'স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব'-এর সূচনালগ্নে ২০২২-এর ১৫ আগস্ট তাঁদের কারামুক্তি দিয়েছিল বিজেপি সরকার। এটাই নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর দল বিজেপির মহিলাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হৃদয়ের আসল চেহারা নয় কি? এটাই আসলে নারী সমাজের উন্নয়নে রাজ্যে রাজ্যে ও কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের ভূমিকা! নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণে তাঁদের এ হেন উৎসাহের পিছনে জঘন্য মতলববাজির স্বরূপ বুঝতে, এর পরেও কোনও অসুবিধা থাকতে পারে কি?

দেখা যাচ্ছে, নিত্য যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, দেশের সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে সংসদ আলো করে রয়েছেন যাঁরা, তাঁদের অধিকাংশই কোটিপতি। সংসদে বসে কেমন ভাবে তাঁরা জনগণের স্বার্থরক্ষা করে চলেছেন, তা নিত্যনতুন জনবিরোধী কালা আইন প্রণয়নে, আদানি-আম্বানি সহ একচেটিয়া পুঁজির হাতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি সহ দেশের সব সম্পদ তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা দেখে এবং জনজীবনের ক্রমবর্ধমান দুর্দশা দেখেই মালুম হয়। মহিলা সংরক্ষণ চালু হলেও একই ঘটনা ঘটবে। দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অপুষ্টি, অশিক্ষা, চিকিৎসাহীনতা ও পুরুষতন্ত্রের দাপটে নির্যাতিত অসহায় সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীসমাজের প্রতিনিধিত্ব করবেন পুরুষ সাংসদদের মতোই ধনী পরিবারগুলি থেকে আসা সুযোগ-সুবিধাভোগী মুষ্টিমেয় কয়েকজন মহিলা, যাঁদের পক্ষে বৃহত্তর নারীসমাজের দুঃখ-যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা দূরের কথা, তা ঠিকমতো বুঝতে পারাও কার্যত অসম্ভব। তাঁরা সংসদে বসে কার্যত শাসক পুঁজিপতি শ্রেণিস্বার্থেরই প্রতিনিধিত্ব করে যাবেন।

আজ যাঁরা মহিলা আসন সংরক্ষণ নিয়ে মাতামাতি করছেন, তাঁদের তো এ কথা অজানা থাকার কথা নয় যে, সংরক্ষণ সমতার চেতনার বিরোধী! প্রকৃত গণতন্ত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সমান অধিকার। নারীদের সমান অধিকার অর্জনের সংগ্রামে সংরক্ষণ কার্যত একটি বিভ্রান্তিকর বাধা হিসাবেই কাজ করে। মহিলা সংরক্ষণের স্লোগানে যাঁরা সোচ্চার, নানা সময়ে দেশের কর্তৃত্বে থাকা সেইসব নেতা-মন্ত্রীদের তো লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল এ কথা ভেবে যে, স্বাধীনতার পর ৭৫ বছর পার হয়ে গেলেও, দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারীসমাজের সম-অধিকার মেলা দূর অস্ত, তাঁদের উন্নয়নে আজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে!

কাজের বাজার সহ সমস্ত ক্ষেত্রে পুরুষের সমান সুযোগ এবং সমাজে পূর্ণ মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচার অধিকারের দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে উঠছে, মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশের কারণে বিভ্রান্ত হয়ে উল্লাসে মাতলে কার্যত সেই আন্দোলনেরই ক্ষতি হবে। বাস্তবে নির্যাতিত নিপীড়িত মহিলারা সমস্ত দিক থেকে বঞ্চিত হতে হতে আজ যখন নিজেদের দাবিতে দেশ জুড়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে অসংখ্য বিক্ষোভে ফেটে পড়ছেন, তাঁদের সেই বিক্ষোভ প্রশমিত করার দাওয়াই হিসাবেই শাসক শ্রেণি আজ মহিলা সংরক্ষণের ধুয়া তুলছে। এতে বিভ্রান্ত হলে বঞ্চিত নির্যাতিত নারীসমাজের ক্ষতিই হবে সবচেয়ে বেশি। বাস্তবে একটি গণতান্ত্রিক দেশে নারী-পুরুষের সমানাধিকার উভয়েরই সম্মিলিত দাবি। এই সমানাধিকার তো একটি সভ্য সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য! কিন্তু গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থাটি শোষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই দাবি অর্জিত হয়নি। ফলে সংরক্ষণের হাওয়ায় ভেসে যাওয়া নয়, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারীদের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত আন্দোলনগুলিকে সঠিক নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করে ন্যায্য দাবি আদায়ে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলার পাশাপাশি শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা উচ্ছেদের সংগ্রামে সামিল হতে হবে। এই কাজে মহিলাদের পাশাপাশি এগিয়ে আসতে হবে দেশের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষদেরও।

রেলে হকার উচ্ছেদ

ছয়ের পাতার পর

২৫ জন হকারকে গ্রেপ্তার করে আরপিএফ। সহায়-সম্বলহীন নিরপরাধ হকারদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করতে রেল কর্তৃপক্ষ যেভাবে পুলিশ লেলিয়ে দিল, যে বর্বরোচিত আক্রমণ চালালো হকারদের উপর, তার নিন্দায় কোনও ভাষাই যথেষ্ট নয়। শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি এর তীব্র নিন্দা করেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দাবি করেন, তিনি নাকি একদা স্টেশনে চা বিক্রি করতেন। অথচ রেল হকারদের প্রতি সামান্য সহানুভূতি দূরের কথা, তাঁদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারটুকুও কেড়ে নিতে চাইছে তাঁর সরকার। আসলে একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থবাহী এই সরকার যেখানে যতটুকু মুনাফা অর্জনের সুযোগ আছে, তা তুলে দিতে চায় বৃহৎ পুঁজির হাতে। তাই আইআরসিটিসি সহ অন্যান্য বেসরকারি সংস্থাকে রেল-ব্যবসায় জায়গা করে দিতেই তাদের এই হকার উচ্ছেদের ফতোয়া।

ক্ষমতায় আসার আগে বেকারত্ব দূর করার যে সব বড় বড় প্রতিশ্রুতি নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর দলবল দিয়েছিলেন, গত কয়েক বছরে সে সব কার্যত জুমলায় পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন বেড়ে চলেছে বেকারত্বের হাহাকার। রেল সহ অন্য কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থায় হাজার হাজার শূন্যপদে নিয়োগ বন্ধ। একের পর এক কলকারখানায় চলছে লে-অফ, কর্মী ছাঁটাই। এই পরিস্থিতিতে দেশের সরকার যখন নতুন কাজের সুযোগ তৈরিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, তখন এই অমানবিক রেল-হকার উচ্ছেদ শুধু হকারদের জীবনকেই দুর্বিষহ করে তুলবে তাই নয়, সমাজ জীবনেও গভীর অস্থিরতা তৈরি করবে। ফলে অবিলম্বে রেল হকার উচ্ছেদের বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার এবং তাঁদের দ্রুত 'হকার আইন ২০১৪'-র অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে সঠিক নেতৃত্বে গড়ে তুলতে হবে ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী হকার আন্দোলন।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

দিল্লিতে হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা

নতুন দিল্লিতে দুষ্কৃতীদের দ্বারা বিশেষভাবে সক্ষম এক মুসলিম যুবকের বর্বরোচিত হত্যার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৮ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

মুসলিম পরিচিতির কারণে এক বিশেষভাবে সক্ষম মুসলিম যুবককে পিটিয়ে হত্যার নিন্দার জন্য কোনও ভাষাই যথেষ্ট নয়। বিজেপি সরকারের আমলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, ধর্মীয় উগ্রতা এমনভাবে বাড়িয়ে তোলা হয়েছে যে, সংখ্যালঘু এবং দলিতদের উপর আক্রমণ, অবমাননা, হত্যা আজ অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

তিনি এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নিন্দার সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রশাসনের কাছে এই দুষ্কৃতীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করার এবং মৃতের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানান।

১২ মাস বেতন ও বেতন বৃদ্ধির দাবি

মিড ডে মিল কর্মীদের অবরোধ

এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের ডাকে ২৭ সেপ্টেম্বর ১০ হাজারের বেশি মিড ডে মিল কর্মী তাঁদের উপর চলা শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে কলকাতায় বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হলেন। তাঁদের ক্ষোভের কারণ, গত ১১ বছরে মিড ডে মিল কর্মীদের ভাতা এক পয়সাও বাড়েনি। শারদোৎসবের আগে বোনাস, বছরে ১২ মাসের বেতন চালু করা, ছাত্র-ছাত্রীদের পুষ্টিকর খাবারের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি সহ ১৩ দফা দাবিতে সোচ্চার হন তাঁরা। তাঁদের উপর শোষণ ও বঞ্চনার কথা তুলে ধরে বিভিন্ন জেলার মিড ডে মিল কর্মীরা বক্তব্য রাখেন। তাঁরা প্রশ্ন তোলেন,

মে মাসে গ্রীষ্মের ছুটি ও অক্টোবরে পূজার ছুটি মিলিয়ে মোট ২০ দিন রান্নার কাজ করতে হলেও এই ২ মাসের বেতন তাঁদের দেওয়া হয় না কেন?

হরিয়ানাতে মাসিক বেতন ৭ হাজার টাকা, কেরালায় ৯ হাজার টাকা, তামিলনাড়ু সরকার ১০ হাজার টাকা দেয়, অথচ 'এগিয়ে বাংলা' প্রচারের কারিগর পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেতন দেয় মাত্র ১৫০০ টাকা। বেতন নির্ধারণের সময় তাদের কি একবারও মনে হয় না যে, এই টাকায় কোনও পরিবারের বাঁচা সম্ভব নয়? সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে স্লোগান মুখরিত ১০ হাজার মিড ডে মিল কর্মীর মিছিল এসপ্ল্যানেডে পৌঁছে লেনিন মূর্তির মোড়ে অবরোধ করে। অবরোধ চলাকালীন সারা বছরের বেতন না দিয়ে ১০ মাসের বেতন দেওয়ার সরকারের কালা সার্কুলারের প্রতিলিপি পড়ানো হয়। অগ্নিসংযোগ করেন রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড সুনন্দা পণ্ডা। সহ সভাপতি কমরেড নিখিল বেরার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল রাজ্যপাল ও আর এক সহ সভাপতি কমরেড রীনা ঘোষের নেতৃত্বে অন্য প্রতিনিধিদল শিক্ষামন্ত্রীকে স্মারকলিপি পেশ করে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড সনাতন দাস ।

ওয়াই চ্যানেলে সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড সুনন্দা পণ্ডা, স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক কমরেড ইসমত আরা খাতুন ও অধ্যাপিকা অনুরূপা দাস, এ আই ইউ টি ইউ সি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক অশোক দাস।

শিক্ষা ধ্বংসের নীলনক্সা জাতীয় ও রাজ্য শিক্ষানীতি বাতিল, ৮২০৭টি সরকারি স্কুল তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র রুখতে

রাজ্য শিক্ষা কনভেনশন

শিক্ষার সামগ্রিক বেসরকারিকরণের নীলনক্সা জাতীয় শিক্ষানীতি ও রাজ্য শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এবং সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে বাঁচাতে ৩০ সেপ্টেম্বর এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে কলকাতার বীরেন্দ্র মঞ্চে রাজ্যস্তরের শিক্ষা কনভেনশন সংগঠিত হয়। ৮২০৭টি সরকারি স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার অপচেষ্টা, প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাকে পরিকাঠামোহীন অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের হাতে তুলে দেওয়া, নবম শ্রেণি থেকে সেমিস্টার সিস্টেম চালু, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা তুলে দেওয়া, তিন বছরের পরিবর্তে ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু, ইতিহাস বিকৃত করে সাম্প্রদায়িক চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটানো, ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের নামে অবৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসার ইত্যাদি শিক্ষা স্বার্থবিরোধী নীতির প্রতিবাদে, প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ ফেল প্রথা চালু, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র খুনের বিচার, অবিলম্বে ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও ক্যাম্পাসগুলিতে পঠনপাঠনের সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবিতে এই কনভেনশন সংগঠিত হয়।

কলকাতায় শিক্ষা কনভেনশনে উপস্থিত ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্টজনেরা

বীরেন্দ্র মঞ্চে উপস্থিত ছাত্র প্রতিনিধিরা

যাদবপুর, প্রেসিডেন্সি সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলা থেকেই ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়, ২৫০টি কলেজ ও শতাধিক স্কুল থেকে ৭০০ জন প্রতিনিধি কনভেনশনে উপস্থিত হন। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধিরা কনভেনশনের মূল প্রস্তাবের সমর্থনে এবং নিজ প্রতিষ্ঠানের সমস্যাগুলি বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন আইআইএসিআর (কলকাতা) -এর অধ্যাপক সৌমিত্র ব্যানার্জী, অধ্যাপক অম্বরনাথ চক্রবর্তী (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), বিশিষ্ট স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ডি পি চক্রবর্তী, এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় নেত্রী কমরেড শ্রুতি শিবহারে, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায়। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক। শিক্ষার উপর সরকারের আক্রমণ যে প্রতিদিন বাড়ছে, তা নিয়ে বিশদভাবে বক্তারা আলোচনা করেন। বক্তারা বলেন, সরকারি শিক্ষা বাঁচানোর দাবিতে দুর্বার ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। একমাত্র শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলনই পারে সরকারি শিক্ষা বাঁচাতে।

উপরোক্ত একই দাবিতে ২৮ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ি শহরের এইচএমএ হলে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি নিয়ে অপর এক রাজ্যস্তরের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরবঙ্গে সব বিশ্ববিদ্যালয়, ৫৬টি কলেজ এবং ৫০টির বেশি স্কুল থেকে ৪৬৫ জন প্রতিনিধি কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক দেবব্রত বেরা (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) , অধ্যাপক সমর কুমার বিশ্বাস (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), বক্ষরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ চন্দন শীট, জেএনইউ-এর ছাত্রনেত্রী সুমন, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায়।

শিলিগুড়িতে কনভেনশন। ২৮ সেপ্টেম্বর

সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সভাপতি কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক। শেষে এয়ারভিউ মোড় থেকে জংশন পর্যন্ত একটি সুসজ্জিত মিছিল হয়।

মূল্যবৃদ্ধি, বেসরকারিকরণ রোধে মধ্যপ্রদেশে বিক্ষোভ

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, পানীয় জল সহ সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার বেসরকারিকরণ, অশ্লীলতা, নেশার সামগ্রীর অবাধ প্রসারের জন্য দায়ী সরকারি নীতির প্রতিবাদে ২৭ সেপ্টেম্বর মধ্যপ্রদেশের গুনায় বিক্ষোভের ডাক দেয় এস ইউ সি আই (সি)। হনুমান চৌরাস্তার মোড়ে এক বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদক কমরেড মনীশ শ্রীবাস্তব, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড লোকেশ শর্মা পেট্রল-ডিজেলের দাম কমানো এবং মদের লাইসেন্স দেওয়ার নীতি প্রত্যাহারের দাবি তোলেন। দলের সদস্য অ্যাডভোকেট সীমা রায় সভা পরিচালনা করেন। জেলাশাসকের কাছে দাবিগুলি নিয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com